প্রজ্ঞাপন

ইফতেখার মাহমুদ

ঐতিহ্য

আমার পিতা বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত
মোহাম্মদ শাহজাহানসহ
মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যাঁরা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন
সেই সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে

কিছু কথা

সকল প্রশংসা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার। ছোটবেলা থেকে আমাদের পরিবারের সকলেরই বই পড়ার প্রতি ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ। স্কুল কলেজে লিখতাম, কিন্তু সেটার প্রচারণা শুধুমাত্র বন্ধুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। করোনা মহামারি চলাকালে প্রবাসে বেশিরভাগ সময়টা ঘরে বন্দি থাকা অবস্থায়, পুনরায় লেখার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে। সে সময় থেকে উপন্যাসটি লিখতে শুরু করি। কাল্পনিক উপন্যাসটি লিখবার জোগান এবং অনুপ্রেরণা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পেয়েছি মূলত আমার প্রয়াত নানি রোকেয়া বেগম এবং শৈশবের হারানো স্মৃতির পাতাগুলো ঘেটে। পরবর্তিতে আমার স্ত্রী জেনিন, দুই আদরের মেয়ে আইজা এবং আজওয়া, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব সকলের অনুপ্রেরণায় অবশেষে উপন্যাসটি শেষ করতে সক্ষম হয়েছি। এজন্য আমি সকলের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি এই সুযোগে আমার অত্যন্ত আপনজন এবং অতি নিকটের পরিচিত, বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তিকে স্মরণ করতে চাই এবং সেইসাথে ধন্যবাদ জানাতে চাই। স্মরণ করি আমার পিতা প্রয়াত বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মো. শাহজাহান, প্রিয় বন্ধু প্রয়াত মেজর খালিদ হোসেন যিনি ২০০৯ সালে বিডিআর বিদ্রোহে শহিদ হয়েছিল ও নিখোঁজ রিপন মামা। দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই বিশিষ্ট লেখিকা লুনা আলমকে এবং প্রবাসী ছোটভাই ও বন্ধু মুকতাদিরকে ।

ইফতেখার মাহমুদ

বিদ্যুতের ঝিলিক আর বাজের আর্তনাদের সাথে ছন্দ মিলিয়ে টিনের চালে সারারাত ধরে মুশলধারায় আবার কখনো বা টিপ টিপ করে বৃষ্টি ঝরেছে। এই ইলশেগুঁড়ির মৌসুমে প্রকৃতির মতো জীবনযাত্রার গতিধারাটিও বেশ মন্থর হয়ে পড়েছে। আষাঢ়ের এই লাগাতার বাদল ধারায় শরীরটা বেশ ম্যাজ ম্যাজ করছে। বেশ আলসেমি লাগছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। এরইমধ্যে বাড়ির পাশের মসজিদ থেকে ভেসে আসা আজানের ধ্বনিটা কানে এসে মনের গভীরে অনবরত প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করল। আমি ওপাশ ফিরে শুলাম। প্রতিদিনের মতো আজও পড়শি পাখিরা তাদের নিত্য দিনের প্রত্যুষকালীন বাক যুদ্ধ শুরু করেছে বাড়ির চারপাশের গাছপালাগুলো থেকে। ঘরের এক কোণে টিনের চালে বেশ কয়েকবার পাখিদের ডানা ঝাপটার আঘাতের শব্দে মনে হলো তাদের মধ্যেকার এই জনাকয়েকের বাগযুদ্ধ ইতোমধ্যেই হয়তো হাতাহাতির পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। বাগবিতণ্ডা হয় আবার ওটা অনেক সময় সংঘাতেও রূপ নেয়। সেটা বিরল কিছু নয়। তবে হাতাহাতি কখনই সম্মানজনক সমাধানের মানদণ্ড হতে পারে না। আমার ধারণা মানুষদের মতো পাখিদেরও সহ্য ক্ষমতা আর নৈতিক মূল্যবোধ সবার সমান নয়।

জুম্মার নামাজটা প্রতি শুক্রবারই গ্রামের ছোট বাজারের নিকট বড় মসজিদে পড়া হলেও নানা কারণে ফজরের নামাজটা নিয়মিত বাড়ির পাশের মসজিদে গিয়ে পড়া হয়ে ওঠে না। কিন্তু আজ প্রত্যুষের নিষ্ক্রিয়তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে নামাজ পড়ার সংকল্পে হুড়মুড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। দ্রুত কাপড় পাল্টে ঘরের দরজাটা খুলে পিছনের উঠনের উপর থাকা চাপ কলের জল দিয়ে ওজু সারার উদ্দেশ্যে সম্মুখে পা-টা বাড়িয়ে দরজাটা খুলেই দেখি, বাড়ির পোষা কুকুরটা আমার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনবরত লেজ দোলাচ্ছে। মনে হচ্ছিল কালু এতক্ষণ আমার ঘরের দরজা খোলার

অপেক্ষাতেই ছিল। ও যেন জানত আমি এখনই দরজা খুলে ঘর থেকে বেরুব। ওর রংটা লালচে দেখালেও ওর নাম রাখা হয়েছে কালু। বাবার এরূপ বৈসাদৃশ্য নামকরণের যৌক্তিকতার কারণটা মনে মনে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে করতে চাপ কলের দিকে এগুলাম। প্রশ্নটা পূর্বে কখনো মাথায় আসেনি কেন ভেবে একটু অবাকই হলাম।

প্রত্যুষের বর্ষার আকাশের অস্থির কালো মেঘমালার দলগুলো আজ হাওয়ার সাথে সন্ধি করে একত্রিত হবার লক্ষ্যে দ্রুত ভেসে চলছে ঘরের পশ্চিম কোণটাতে। বিক্ষিপ্ত মেঘমালাগুলোকে বয়ে নেয়া সেই মৃদুমন্দ হাওয়ার ঝাপটায়, স্যাঁতসেঁতে উঠনটার কল পাড়ের আশপাশে বেড়ে ওঠা নারকেল আর পেঁপে গাছের রাতের ঝিমিয়ে পড়া অলস পাতাগুলো ইতোমধ্যেই এলোমেলোভাবে দোল খেতে শুরু করেছে। দেখে মনে হলো, ওরা যেন পূর্বাহ্নের সূর্যোদয়ের পূর্বেই রাত্রিকালীন জড়তা দূর করে সবেমাত্র আড়মোড়া ভাঙতে শুরু করছে। আমি তাড়াহুড়ো করে ওজুটা সেরে সামনের উঠনটা পেরিয়ে, সদর দরজার দিকে এগিয়ে চললাম। কালু লেজ নাড়তে নাড়তে আমার পিছন পিছন অনুসরণ করে উঠন পেরিয়ে বাইরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি বাইর থেকে দরজটা ভেড়ানোর সাথে সাথে কালু যথারীতি ওর বাড়ি পাহারার দায়িত্বটা বুঝে নিলে, আমিও নিশ্চিন্ত মনে মসজিদের উদ্দেশে দ্রুত পা বাড়ালাম।

এই মেঘলা আর্দ্র সকালেও বহুসংখ্যক মুসল্লি আজ ফজরের নামাজে মসজিদটিতে শরিক হয়েছেন। অনির্দেশ্য পদ্মার তীব্র অব্যাহত ভয়াবহ ভাঙন আর তীরবর্তী মানুষজনের দুর্দশা রোধের সংকল্পে গ্রামের প্রতিটি মসজিদ আর মন্দিরে আজ থেকে বিশেষ নামাজ, দোয়া এবং প্রার্থনার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। গ্রামের সনাতন ধর্মাবলম্বী এলাকাবাসীরা কয়েকদিন পূর্বেও ঐ পদ্মার নির্মম ভাঙন ঠেকাতে গঙ্গা পুজোর আয়োজন করেছিল পদ্মা পাড়ে। মোনাজাত শেষে লক্ষ করলাম মসজিদের বিভিন্ন অংশে তিন চারজনের দলে বিভক্ত হয়ে মুসল্লিগণ কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গভীর আলাপচারিতায় মগ্ন। সবার চোখে মুখেই উদ্বেগের ছাপ স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আলোচ্য বিষয় অনুসন্ধানে পরিচিত মুখ খুঁজে বের করে আমি কয়েকটি দলের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তাদের বাক্যালাপ শুনতে চেষ্টা করলাম। সংশ্লিষ্টতায় অনুভব করলাম, পদ্মার এই আকস্মিক ভাঙনের আতঙ্কের শিকড়টি,

ইতোমধ্যেই সকলের অজান্তেই ধীরে ধীরে গ্রামবাসীদের মনের গহিনে নীরবে দানা বাঁধতে শুরু করছে।

মসজিদের উদ্বিগ্ন ইমাম সাহেব অবহিত করলেন, পদ্মার ভাঙন তীরবর্তী বড় মসজিদটির অতি সন্নিকটে চলে আসায় সেই মসজিদ কমিটির সদস্যবৃন্দ ইতোমধ্যেই দরজা জানালা আর আসবাবপত্র অন্যত্র ত্বরিত সরিয়ে নেবার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দেখছেন। শুভ্র গোঁফ-দাড়ি আর কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলের নুরানি চেহারার গ্রামের ফকির বাড়ির ইয়াসিন ফকির ভাঙন শুরু হবার পর থেকেই ঘনিষ্ঠ নিবিড় চোখ রাখছেন ক্রমাগত ধ্বংসে মেতে ওঠা পদ্মার গতি- প্রকৃতি আর ভাঙনের উপর। ভাঙনরত পাড়ের সন্নিকটে থাকা বড় মসজিদ, কালী মন্দির আর মিয়া বাড়ি বিলীন হলেই গুচ্ছবদ্ধ ফকিরদের বসতভিটাগুলো সরাসরি বেপরোয়া পদ্মার ধ্বংসের রোষানলের নাগালের মধ্যে পড়বে বলে তার আগাম অনুসন্ধানী আশঙ্কার কথা তিনি ব্যক্ত করলেন। বিরামহীন এই পাড় ধসে পড়ার সংবাদে, শঙ্কায় আর উৎকণ্ঠায় প্রতিটি রাতেই তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক আসলাম মাস্টার সকলকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন, গ্রামের বড় বাজার, ফসলি জমি, নদী পাড়ের বসতভিটা, মাদ্রাসা আর যে স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন, সেগুলো পদ্মার নিষ্ঠুরতায় ইতোমধ্যেই বিলীন হয়েছে। তিনি আলাপচারিতা অব্যাহত রেখে সবাইকে সতর্ক করে বললেন, স্থানীয় প্রশাসন জরুরি ভিত্তিতে এখন যদি দ্রুত হস্তক্ষেপ করে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে এই গ্রামকে সর্বনাশা পদ্মার রোষানল থেকে রক্ষার কোনো পথই উন্মুক্ত থাকবে না। মুসল্লিদের মধ্যে অনেকে আবার ইতোমধ্যেই অত্যধিক বিলম্ব হয়ে গিয়েছে বলে তাদের হতাশা ব্যক্ত করলেন। আরও কিছুটা সময় নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপের পর আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, আজ মধ্যাহ্নে সরজমিনে পদ্মার ভাঙন পর্যবেক্ষণে যাব। আর সেই সংকল্প নিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে প্রথমে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললাম।

বড় মসজিদ এলাকায় পাড়ের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে বেশ কিছু দৌর্মনস্য মানুষ পাড় ভাঙা দেখছে। মসজিদ থেকে একটু দূরত্বে একটি শামিয়ানার সামনে লোক জনের ছোটখাটো জটলা লক্ষ করে আমি কৌতূহলবসত অনুসন্ধিৎসু মনে প্রথমে সেদিকটায় এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

ভাঙনরত পাড় ঘেঁষে বুক সমান উঁচু মোটা কঞ্চির উপর একটি লাল পতাকা বৈরী হাওয়ার সাথে অবিরত যুদ্ধ করে অবিশ্রান্তভাবে পতপত করে উড়ছে। আর দমকা বাতাসের তোড়ে বারবার নুয়ে পড়া কঞ্চিটার ঠিক সন্নিকটেই একই উচ্চতার আরও দীর্ঘ চারটি বাঁশের খুঁটির শীর্ষভাগে রশি দিয়ে বাঁধা একটি চার কোনা লাল কাপড়ের শামিয়ানা দমকা হাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে অবিরত হাওয়াতে অস্থির ঢেউ তুলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে হাওয়ার তাণ্ডবে যে কোনো মুহূর্তে ওটা উড়ে আকাশে পাড়ি জমাবে।

সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা কৌতূহলী কিছু লোকজন আবার উন্মুক্ত শামিয়ানার ভিতরে পাটির উপর বসে থাকা কয়েকজন মেয়েমানুষদের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। উদ্দাম হাওয়ার দাপটে তাদের সম্মুখে থাকা জ্বলন্ত ধোঁয়া ছড়ানো কয়েকটি আগরবাতি দ্রুত ভস্ম হচ্ছে আর মোমবাতিগুলো বার বার নিভে যাচ্ছে। উদ্দাম হাওয়ার তোড়ে মোমবাতিগুলো যেন না নিভে যায় সেই সংকল্পে, ভেতরে বসে থাকা মেয়েমানুষগুলো যথাসাধ্য শিখাগুলোকে হাত দিয়ে আড়াল করে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে চলছে। যদিও মাঝে মধ্যেই শিখাগুলো হাওয়ার ঘূর্ণি ঝাপটায় নিভে যাচ্ছে, তবে পর্যায়ক্রমে সেগুলোকে পুনরায় দিয়াশলাই দিয়ে জ্বালানো হচ্ছে। প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধানে অন্য সকলের মতো আমিও মনের ভেতর নানা দ্বিধা, প্রশ্ন, আর কৌতূহল নিয়ে উৎসুকচিত্তে শামিয়ানার খুব নিকটে এসে দাঁড়ালাম। লক্ষ করলাম, বস্তুত উপস্থিত সকল লোকজনের সম্মোহনী দৃষ্টি সম্পূর্ণ রূপে শামিয়ানার সম্মুখে পায়চারিরত লিকলিকে চেহারার একজন অদ্ভুত দর্শন লোকের উপর স্থির হয়ে আছে। লোকটিকে দেখে মনে হলো বহুদিন ধরে সে স্নান করেনি। বৃষ্টিতে ভিজে আর রোদে পুড়ে দাড়ি-গোঁফে ঢাকা তামাটে মুখখানার সাথে তার চুলগুলোতেও তামাটে রং ধরা শুরু করেছে। গলায় ঝুলে আছে কয়েক পট্টি রুদ্রাক্ষ আর পাথরের মালার গোছা। পরনের শতচ্ছিন্ন জামা আর লাল লুঙ্গিটি হাঁটুর একটু নিচ পর্যন্ত উঠে আছে। লোকটা মুখে একরাশ বিরক্তির ছাপ নিয়ে হাত দুটো মুঠো করে বারবার আকাশ আর জলের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে ক্রমাগত পদ্মাকে বিষোদ্গার করে চলছে। আর সেইসাথে লোকটার ক্রোধে ফুঁসে ওঠা টকটকে লাল চোখ দুটো ঠিকরে যেন বিদ্বেষের জ্বলন্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ক্রমাগত বেরিয়ে আসতে চাইছে স্রোতস্বিনীকে ভস্ম করার অভিপ্রায়ে।

পর্যায়ক্রমে ছুটে আসা উত্তাল ঢেউয়ের ক্রমাগত আঘাতে হঠাৎ করে ফাটল ধরা পাড়ের একটি বিশাল অংশ সে সময় সশব্দে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল উত্তাল জলে। পাড় ধসে পড়ার সেই ঝপাৎ শব্দটি কর্ণগোচর হওয়ামাত্র মনে হলো, লোকটি স্রোতস্বিনীকে বিষোদ্গার করা বন্ধ করে কয়েক মুহূর্তের জন্য নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর নির্ভুলভাবে ভাঙনের শব্দটার উৎসস্থলটা নির্ধারণ করার সংকল্পে চোখদুটোর সাথে মাথাটাকেও এদিক-ওদিক ঘোরাতে শুরু করল। অবশেষে পাড় জলে ধসে পড়ার স্থানটি নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করে সেদিকটায় স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, নাসারন্ধ্রটা ফুলিয়ে দ্রুত কয়েকবার হাওয়াটাকে শুঁকে নিল। অতঃপর জলের নৃশংসতায় ক্রুদ্ধ লোকটি অশান্ত জলকে ভস্ম করার সংকল্পে রক্তাক্ত চোখে সেদিকটায় তাকিয়ে রইল। পরক্ষণেই বিড়বিড় করতে করতে সহসা নুয়ে পড়ে পাশে পড়ে থাকা একটা ভাঙা হাঁড়ির চাড়া ভূমি থেকে তুলে নিয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে ধসে পড়া সেই পাড়ের জলের দিকটাতে ছুড়ে মেরে সেদিকটায় চেয়ে হাত-পা নেড়ে অবোধ্য ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে দুর্ভেদ্য কিছু বলতে শুরু করল। জলকে অভিসম্পাত দেয়া শেষ করার পর মুহূর্তেই লোকটি আবার দুহাত ছড়িয়ে মিলিটারির মতো দ্রুত পায়চারি করতে করতে নিচু হয়ে শামিয়ানার তলে ভক্তবৃন্দের ঠিক মাঝখানে এসে পদ্মাসনে বসে পড়ে চোখ বুঁজে পুনরায় বিড়বিড় করতে শুরু করল। একই ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে বসে থাকার পর সে অকস্মাৎ একটি হুঙ্কার দিয়ে দুহাত উপরে তুলে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে করতে আবার শামিয়ানার সামনে এসে দাঁড়াল। কিম্ভূতকিমাকার লোকটি এভাবে পূর্বের সেই উদ্ভট কার্যকলাপগুলো একইভাবে পুনরায় পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করল। আশপাশের লোকজনের সাথে বাক্যালাপে অবহিত হলাম "পাগলা বাবা" দিন কয়েক হলো এখানে এসে আস্তানা গেড়েছেন। তবে প্রশ্নোত্তরে কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে পারল না ঠিক কখন কীভাবে কোথা থেকে দৈবক্রমে লোকটির এখানটায় আগমন ঘটেছে। জনাকয়েকের অভিমত, উনি দূরের অচেনা কোনো গ্রাম থেকে এখানে এসেছেন। আবার অনেকের ধারণা "পীর বাবা" রাতের আঁধারে নদী থেকে আকস্মিকভাবে উদয় হয়ে পদ্মার ভাঙনরোধের সংকল্পেই এখানে আস্তানা গেড়েছেন। আস্তানা গাড়ার সাথে সাথেই তিনি ভাঙন রোধকল্পে লাল পতাকা সমেত মোটা ঐ কঞ্চিটাকে নদীর পাড় ঘেঁষে ভাঙন প্রতিরোধের সর্বশেষ সীমানা নির্ধারণী

প্রতীক হিসেবে মন্ত্র পড়ে গেঁথে দিয়েছেন। এতসব কিছুর পরেও ভাঙন কিন্তু থেমে থাকেনি।

পক্ষান্তরে ক্রমাগত ভাঙন অব্যাহত থাকায় প্রতিদিনই ভাঙন প্রতিরোধের সীমানার প্রতীক সেই লাল পতাকার কঞ্চিটির অবস্থানটি বেশ কয়েকবার পরিবর্তন করতে হয়েছে। তবে এতসব কিছুর পরেও পাগলা বাবার ভাঙন রোধের অকোমল চেষ্টা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

সেইসাথে এই মহাসংকট থেকে পরিত্রাণের একটি সুরাহা অনুসন্ধানে হতাশাগ্রস্ত বিপর্যস্ত লোকজনের ভিড়ও শামিয়ানার পাশে ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। চন্দ্রাহত ব্যক্তিটির এই অসামঞ্জস্য অদ্ভুত আচরণ লক্ষ করে আমি বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলাম। অনুসন্ধিৎসু মনে কয়েকটি প্রশ্ন এসে দানা বাঁধল।

সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ অস্বাভাবিক লোকটি কি অর্ধ পাগল, না পুরোপুরি পাগল? পীর বাবা কি আসলেই সত্যিকারের একজন সাধুপুরুষ? তিনি কি একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি? নাকি ঐ সবকিছু শুধুই তামাশা!

মসজিদের ভিতরে প্রচণ্ড ব্যস্ততা। কয়েকজন মিস্ত্রি পদ্মার ভাঙনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত থেকে সময়ের সাথে প্রতিযোগিতা করে দ্রুত দরজা জানলা বিচ্ছিন্ন করে চলেছে। আর মুসল্লিরাও স্বেচ্ছায় সেগুলোকে ক্ষিপ্রতার সাথে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে ব্যস্ত। ইমাম সাহেব মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে মুয়াজ্জিনকে সঙ্গে নিয়ে একটি বড় লোহার ট্রাঙ্কের ভিতর কাগজপত্র আর ধর্মীয় পুস্তকগুলো ত্বরিত গুছিয়ে রাখছেন। চারদিক থেকে দেয়ালে অনবরত ভারি হাতুড়ি পেটার শব্দ এসে কান দুটোকে নিষ্পেষণ করে চলেছে। ট্রাঙ্কটি পুরোপুরি ভর্তি হওয়া মাত্র তালাটি বন্ধ করে ইমাম সাহেব একটু বিরতি নিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসে সামনের সীমানার দেয়াল ধরে দাঁড়ালেন। তারপর সম্মুখের আছড়ে পড়া জলের দিকে বিষণ্ন পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। সামান্য বাক্যালাপের উদ্দেশ্যে আমিও তার পিছু পিছু দেয়ালের পাশে এসে দাঁড়ালাম। ভাঙন পাড়ে দাঁড়িয়ে জনাকয়েক লোক জলের দিকে তাকিয়ে পাড়ের ভাঙন নিরীক্ষণের চেষ্টা করছে। ইমাম সাহেবের মুখখানি অতিশয় মলিন দেখাচ্ছে আর চোখ দুটোও বেশ লাল হয়ে আছে। দুশ্চিন্তায় সারারাত হয়তো তার ঘুম হয়নি। চোখে চোখ পড়তেই আমি সালাম দিলাম। সালামের প্রত্যুত্তর দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে উদ্বেজিত ইমাম সাহেব পুনরায় উত্তাল জলের দিকে দৃষ্টি রেখে হতাশার সুরে আমাকে উদ্দেশ করে বলতে শুরু

করলেন, - নদীর স্রোতের তোড় দিন দিন যেইভাবে বাইড়া চলতেছে, তাতে নদীর পাড় দিয়া গইড়া ওঠা গ্রাম রক্ষা বাঁধ আর টিকব কিনা সন্দেহ আছে। বাঁধের কোনো কোনো জায়গায় এরই মইধ্যে ফাটল দেখা দিছে। যে কোনো সময়ে বাঁধটা ধ্বইসা পড়তে পারে। তিনি এবার ডান হাতের তর্জনীটা স্রোতস্বিনীর দিকে নির্দেশ করে বললেন, ঐ যে দূরে যেখানটায় জলে কচুরিপানাগুলি পাক খাইতেছে দেখতে পাইতেছ, সেইখানে এক সময় ছিল বড় বাজারের একাংশ, ছিল আমার পারিবারিক বসতভিটা আর লোকজনের বিশাল ক্ষেতি জমি। বিস্তৃত ফসলের খেতগুলি এক দৌড়ে পার হওয়া সম্ভব ছিল না। পথিমধ্যে গাছের তলায় জিরাইয়া যাইতে হইত। কিন্তু এখন আর তার কোনো কিছুই অবশিষ্ট নাই।

সবকিছুই জলের হিংস্রতায় ধ্বংস হইয়া বিলীন হইয়া গেছে। এইভাবে চলতে থাকলে অতিশীঘ্রই হয়তো মসজিদটিও নদীর তাণ্ডবে বিলীন হইয়া যাইব।

কথাগুলো বলতে বলতেই তার গলাটা ধরে এল। তিনি বাক্যহারা হয়ে তার লালচে চোখ দুটো যেন আর্দ্রতায় ভরে উঠল। চোখের জলকে আড়াল করার সংকল্পে তিনি কিছুটা সময় পায়ের তলার ভূমির উপর দৃষ্টিটা আটকে রাখলেন। তারপর মাথাটা তুলে বিষণ্ন দৃষ্টিতে ভেজা চোখে চেয়ে রইলেন তোলপাড় করা ঐ বেপরোয়া জলের ভাঙনের দিকে। আমিও মৌন থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভগ্নহৃদয়ে ইমাম সাহেবের চোখ দুটোকে অনুসরণ করে ঝাপসা চোখে স্রোতের উপর সেই ঘূর্ণায়মান কচুরিপানার গতিপথের দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম।

ধরণির উপর প্রকৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য। আগুনে পুড়ে গেলে ছাই মেলে। ঝড়ের আঘাতের পর মেলে ভগ্নাংশ। আর নদীর ভাঙনে মেলে শুধুই শূন্যতা।

চোখের সম্মুখে শুধুই জল আর ভয়াবহ স্রোত। ভয়ংকর পদ্মার উদ্দাম স্রোতরাশি এক বর্বর তাণ্ডবতা চালাচ্ছে গ্রামের এপাশটিতে। ভাঙনের শঙ্কায় তীরবর্তী মসজিদ আর পার্শ্ববর্তী কালী মন্দিরের আসবাবপত্রগুলো দ্রুত সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে অনত্র সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। মসজিদের সম্মুখের দোকানপাটগুলো বিচ্ছিন্ন করে ইতোমধ্যেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে নিরাপদ দূরত্বে। ভোগের অপেক্ষায় সেখানে এখন শুধুমাত্র পড়ে আছে অবশিষ্ট